OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 163 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 163 - 173
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ইতিহাস ও কল্পনার পুনর্নির্মাণে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শশাঙ্ক’

মৌসুমী বর্মন
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
(আর্য মহিলা পি.জি কলেজ)
Email ID: barmanmousumi401@gmail.com
0009-0006-8715-9744

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Rakhaldas Bandyopadhyay, Shashanka, historical novel, historical consciousness, politico-religious conflict, ancient Bengal, Bengali self-identity.

Abstract

Shashanka was a ruler of ancient Bengal who is believed to have reigned in the seventh century CE. He occupies a significant place in the history of Bengal. It is generally believed that he consolidated several small kingdoms and established the political entity known as Gauda. Focusing on the personal and political life of Shashanka, the historian and archaeologist Rakhaldas Bandyopadhyay wrote a historical novel entitled Shashanka. The novel is a significant contribution to the tradition of Bengali historical fiction. It is not merely a narrative of a political episode from the past; rather, it brings together multiple layers of historical reconstruction, the search for national identity, religious conflict, and colonial historiography. Rakhaldas Bandyopadhyay's identity as an archaeologist and historian lends a distinctive dimension to his literary creation. Working within the limitations of historical sources and confronted with contradictory accounts, he constructs an alternative representation of Shashanka. In particular, in contrast to the negative image of Shashanka found in Banabhatta's Harshacharita and the Aryamanjushrikalpa, the novel attempts to portray him as a powerful and politically conscious ruler who was actively engaged in establishing the distinct political identity of Gauda.

This paper examines the relationship between history and imagination in Shashanka, the construction of Shashanka's character, the interrelationship between religion and politics, nationalist historical consciousness, and the reconstruction of the past within the colonial context. The central argument of the paper is that Shashanka should not be read merely as a historical novel; rather, it should be understood as an important example of how history is reconstructed through literary narrative and how such reconstruction becomes connected with contemporary questions of identity and selfhood. As an archaeologist and historian of considerable standing, Rakhaldas Bandyopadhyay entered the field of fiction with the intention of making the history of ancient Bengal accessible and engaging to the general reader. The limitations of Pashaner Katha made him realise that it was difficult to awaken historical consciousness among ordinary readers through purely research-oriented historical writing. It was from this need that the idea of Shashanka

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 163 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

emerged. The novel brings together the political history of seventh-century Bengal and northern India, the legacy of the Gupta Empire, the rise of regional political powers, and the question of Bengal's political existence. At the same time, alongside historical figures, Bandyopadhyay introduces fictional characters such as Yashodhabal, Chitra, Latika, and Shatrusen, as well as various subplots, thereby combining historical narrative with the aesthetic appeal and dramatic possibilities of fiction.

This paper therefore analyses the motivation behind the composition of Shashanka, its historical consciousness, narrative structure, characterisation, the political and religious conflict involving Buddhism, the relationship between history and imagination, and the author's attempt to construct a sense of Bengali identity. Through these aspects, the novel can be understood as a literary reconstruction of the past in which historical inquiry, creative imagination, and the search for collective identity intersect.

Discussion

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫–১৯৩০) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ, অভিলেখ বিশেষজ্ঞ এবং সাহিত্যিক। তাঁর জন্ম মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। ১৯১০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। প্রথমে তিনি কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে কাজ শুরু করেছিলেন এবং পরে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণে যোগ দেন। ১৯২২ সালে মহেঞ্জোদারো আবিষ্কার করার কৃতিত্ব প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছিল। এছাড়া তিনি পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার ও মন্দির খনন করেছিলেন এবং মহাস্থানগড়, ঘোড়াঘাট ও তেজপুরের দহ-পার্বতীয়া এলাকায় প্রত্নবস্তু আবিষ্কার করেছিলেন। ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের ওপর নতুন তথ্য আহরণ করেছিলেন তিনি। তাঁর স্বল্প জীবনে তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তক, উপন্যাস এবং তিনশোর বেশি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'শশাঙ্ক', 'ধর্মপাল', 'করুণা', 'ময়ূখ', 'অসীম', 'ধ্রুবা', 'লুৎফউল্লা'। 'শশাঙ্ক', 'করুণা' ও 'ধ্রুবা' - প্রাচীন বাংলার গুপ্ত উত্তর পর্বের ইতিহাস, 'ধর্মপাল' পালযুগের ইতিহাস, 'ময়ূখ', 'অসীম' ও 'লুৎফউল্লা' মোগল যুগের বাংলার জীবনকে কেন্দ্র করে নির্মাণ করেছেন।

শশাঙ্ক ছিলেন প্রাচীন বাংলার একজন শাসক। যিনি বিভিন্ন ক্ষুদ্ররাজ্যকে একত্র করে গৌড় নামের জনপদ গড়ে তোলেন। তিনি খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজত্ব করেছেন বলে ধারণা করা হয়। কারো কারো মতে তিনি ৬০০ থেকে ৬২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেন বলে ধারণা করা হয়। তাঁর রাজধানীর নাম কর্ণসুবর্ণ বা কানসোনা। প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম বাঙালি রাজা, বাঙালির ইতিহাসে হয়তো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্রাট। তাঁর থেকেই কিন্তু গৌড়বঙ্গের উত্থান শুরু তার আগে বঙ্গ মগধের এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। বানিজ্যিক সমৃদ্ধির জন্য নজরও কেড়েছিল। শশাঙ্ক পুরো ভারতবর্ষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন বাঙালি আর বাংলার প্রতি সমীহ। যে প্রেরণা নিয়ে এরপর বঙ্গকে কেন্দ্র করে আসবেন পালরা, সেনরা, মোগলরা আর ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হবে বাংলা। বাংলার ইতিহাসে তিনি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। সেই শশাঙ্কের ব্যক্তিজীবন এবং রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন। উপন্যাসটির নাম দিয়েছেন 'শশাঙ্ক'। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শশাঙ্ক' একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই উপন্যাস শুধু অতীতের একটি রাজনৈতিক পর্বের কাহিনি নয়; এর মধ্যে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ, জাতীয় আত্মপরিচয়ের সন্ধান, ধর্মীয়দ্বন্দ্ব এবং ঔপনিবেশিক ইতিহাসচেতনার নানাস্তর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদ হিসেবে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে পরিচয়, তা তাঁর সাহিত্যিক সৃষ্টিকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। ঐতিহাসিক সূত্রের সীমাবদ্ধতা ও পরস্পরবিরোধী বিবরণের মধ্য থেকে তিনি শশাঙ্কের একটি বিকল্প চরিত্র নির্মাণ করেছেন। বিশেষত বানভট্ট-এর 'হর্ষচরিত' ও 'আর্যমঞ্জুশ্রীকল্প'-এর বিবরণে শশাঙ্কের যে নেতিবাচক প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়, তার বিপরীতে উপন্যাসে তাঁকে একজন শক্তিশালী রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং গৌড়ের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় শাসক হিসেবে উপস্থাপনের প্রয়াস করেছেন। এই প্রবন্ধে শশাঙ্ক-এর ইতিহাস ও কল্পনার সম্পর্ক, শশাঙ্কের চরিত্র নির্মাণ, ধর্ম ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 163 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক, জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচেতনা এবং ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতে অতীতের পুনর্নির্মাণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণায় সুপ্রতিষ্ঠিত রাখালদাস যখন কথাসাহিত্যে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রাচীন বাংলার ইতিহাসকে সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য ও আকর্ষণীয় করে তোলা। পাষাণের কথা-র সীমাবদ্ধতা তাঁকে উপলব্ধি করিয়েছিল যে কেবল গবেষণাধর্মী ইতিহাসের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে অতীত-চেতনা জাগানো সম্ভব নয়। সেই প্রয়োজন থেকেই শশাঙ্ক-এর পরিকল্পনা। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হিসেবে প্রকাশের পূর্বে 'শশাঙ্ক' নামেই রাখালদাস 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র ও কার্তিক সংখ্যায় দুটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে 'মানসী' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১৩১৯ থেকে মাঘ ১৩২১ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি তিনি তাঁর শিক্ষাগুরু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে উৎসর্গ করেন। তবে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি নিবন্ধের সঙ্গে পরবর্তীকালের শশাঙ্ক উপন্যাসের কাহিনির সরাসরি সম্পর্ক নেই। 'মানসী'-র সম্পাদকও বিষয়টি স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন যে পূর্ব প্রকাশিত নিবন্ধ দুটির সঙ্গে উপন্যাসের আখ্যানের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই নামের সাদৃশ্যকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের রচনাপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যথার্থ নয়। শশাঙ্ক-এর রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবনের জন্য উপন্যাসের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে রাখালদাস পাষাণের কথা-র প্রসঙ্গ তুলে বলেছেন যে, সেই গ্রন্থ মনীষীদের প্রশংসা পেলেও সাধারণ পাঠকের কাছে তা সহজবোধ্য হয়ে ওঠেনি। তাই দুই বছর পরে শশাঙ্ক রচনার উদ্যোগ নেন। যা থেকে স্পষ্ট যে, শশাঙ্ক রচনার পেছনে মূলত একটি জনমুখী ইতিহাসচেতনা কাজ করেছিল। রাখালদাস ইতিহাসকে কেবল পণ্ডিতসমাজের আলোচনার বিষয় হিসেবে রাখতে চাননি; তিনি চেয়েছিলেন সাধারণ পাঠকও যেন ইতিহাসের সঙ্গে আবেগগতভাবে যুক্ত হতে পারেন। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য গবেষণামূলক ইতিহাসের পরিবর্তে কথাসাহিত্য তাঁর কাছে অধিক কার্যকর মাধ্যম হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক ইতিহাসচর্চার বিকাশের সঙ্গে বাঙালির আত্ম অনুসন্ধানের প্রবণতা গভীরভাবে সম্পর্কিত। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা যখন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছিল, তখন শিক্ষিত ভারতীয়দের একাংশ নিজেদের অতীতকে নতুন করে আবিষ্কারের প্রয়োজন অনুভব করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রমেশচন্দ্র দত্ত এবং পরবর্তী লেখকদের রচনায় অতীতের পুনর্নির্মাণের মধ্যে সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির নানা প্রশ্ন প্রতিফলিত হয়েছে। গৌড়রাজ শশাঙ্ককে কেন্দ্র করে নির্মিত এই উপন্যাসে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস, ধর্মীয় দ্বন্দ্ব, রাজশক্তির প্রসার এবং ব্যক্তি চরিত্রের নানাদিক রয়েছে। উপন্যাসটিতে লেখক ইতিহাসকে কাহিনিতে রূপান্তর করার পাশাপাশি কাহিনিকেও ইতিহাসের মতো বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তিনি ইতিহাসের তথ্যকে অবিকৃতভাবে সাজিয়ে দেননি বরং তথ্যের ফাঁকগুলিকে কল্পনার সাহায্যে পূরণ করেছেন। আর তাই 'শশাঙ্ক' ইতিহাস ও উপন্যাস - এই দুই স্বতন্ত্র প্রকরণের মধ্যবর্তী একটি সৃজনশীল ক্ষেত্র হয়ে ওঠেছে। উপন্যাসের অন্তর্নিহিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল প্রাচীন বাঙালির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে সামনে আনা। রাখালদাসের ইতিহাসচেতনায় মুসলমান শাসনের পূর্ববর্তী বাংলা একটি সক্রিয়, প্রাণবন্ত এবং রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড। তাই শশাঙ্ক-এ তিনি এমন একটি সময়কে বেছে নিয়েছেন যখন বাংলা কোনো রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় অঞ্চল ছিল না; বরং শশাঙ্কের নেতৃত্বে গৌড় একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হয়েছিল। শশাঙ্কের উত্থানের মধ্যে তিনি প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশ দেখতে চেয়েছেন। তাই শশাঙ্ক কেবল একজন রাজা নন; তিনি উপন্যাসে বাঙালির প্রাচীন রাজনৈতিক সক্ষমতার প্রতীক হয়ে ওঠেন। এই কারণে শশাঙ্ককে শুধু রাজজীবনের উপন্যাস হিসেবে পাঠ করলে তার বৃহত্তর তাৎপর্য ধরা পড়ে না। এটি একই সঙ্গে অতীতের মধ্য দিয়ে আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের উপন্যাস।

শশাঙ্ক উপন্যাসটি লেখক আটান্নটি পরিচ্ছেদে তিনটি পর্বে লিখেছেন। তিনটি পর্ব হল - প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন- যে পর্বগুলির মাধ্যমে শশাঙ্কের জীবনকে তুলে ধরেছেন। প্রভাত অংশে শশাঙ্কের বাল্য ও কৈশোরের বিকাশ, তাঁর চরিত্রগঠন এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ভূমিকার প্রস্তুতি দেখানো হয়েছে। এখানে ব্যক্তিমানুষ শশাঙ্ক ধীরে ধীরে ভবিষ্যৎ রাজপুরুষে পরিণত হন। শশাঙ্ক ও মাধবগুপ্তের শিক্ষার দায়িত্ব প্রথমে লল্ল এবং পরে যশোধবলদেবের মতো চরিত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। লল্ল তাঁকে অস্ত্রবিদ্যার পাশাপাশি গুপ্তবংশের বীরত্বের ইতিহাস শোনান। বিশেষত সমুদ্রগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের বীরত্বের কাহিনি শশাঙ্কের রাজনৈতিক চেতনা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এর বিপরীতে মহাসেনগুপ্তের চরিত্রে দেখা যায় ভীতি,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 163 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অস্থিরতা ও ভাগ্যনির্ভরতা। ফলে পিতৃপ্রজন্মের দুর্বলতা এবং নতুন প্রজন্মের সম্ভাবনার মধ্যে একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়। শশাঙ্ক এখানে পুরাতন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার বহন করলেও তার পুনর্গঠনের সম্ভাবনাও ধারণ করেন। যশোধবলদেব এই চরিত্রগঠনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। তিনি শশাঙ্ককে শুধু যুদ্ধবিদ্যা নয়, রাজ্য পরিচালনা ও রাজনৈতিক বাস্তবতার পাঠ দেন। তাঁর চোখে শশাঙ্ক ভবিষ্যৎ মগধের রক্ষক। ফলে শশাঙ্কের ব্যক্তিগত বিকাশের সঙ্গে রাজ্যের ভবিষ্যৎ ক্রমশ একসূত্রে বাঁধা পড়ে। এই পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদের শুরুতে এক বালকের কথা লেখক বলছেন -

> "বর্ষার প্রারম্ভে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে, শোণের সম্মুখে, প্রাসাদের বাতায়নে, একটি বালক ও জনৈক বৃদ্ধ দণ্ডায়মান ছিল। বালক গৌরবর্ণ, রক্তাভবীর্য কেশরাশি তাহার পৃষ্ঠ চুম্বন করিতেছিল, শীতল সান্ধ্যসমীরণ আসিয়া তাহার কেশপাশের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছিল।"[১]

উপন্যাসের সূচনায় শোন নদীর সঙ্গমে জলক্রীড়ারত পিঙ্গলকেশী বালক শশাঙ্কের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা চরিত্রটির প্রাণশক্তি ও স্বাভাবিকতার পরিচায়ক। তিনি শুরু থেকেই কেবল রাজবংশের উত্তরাধিকারী নন; তাঁর মধ্যে একধরনের সক্রিয়তা, সাহস ও নেতৃত্বের সম্ভাবনা নিহিত -

> "বালক জিজ্ঞাসা করিল, 'নূতন সিংহাসনখানা কাহার?' একজন পরিচারক উত্তর করিল, 'থানেশ্বরের সম্রাটের'। বালক চমকিয়া উঠিল। তাহার সুন্দর মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং সে নিকট-স্থিত একখানি হস্তিদন্তনির্মিত সুখাসন ধারণ করিল। দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টিতে হস্তিদন্ত চূর্ণ হইয়া গেল, পরিচারকগণ ভয়ে দুই হস্ত সরিয়া দাঁড়াইল। রোষরুদ্ধকণ্ঠে বালক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বলিলি?' কেহ উত্তর দিল না।"[২]

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। একদিকে গুপ্তবংশীয় রাজারা পূর্বের সামাজিক মর্যাদা ধরে রাখার চেষ্টা করছিলেন, অন্যদিকে মৌখরি ও বর্ধনদের মতো নতুন শক্তিশালী রাজবংশ উত্তর ভারতে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করছিল। একই সঙ্গে পাটলিপুত্রের পতন এবং কনৌজের উত্থান উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিল। মহাসেনগুপ্ত উপলব্ধি করেছিলেন যে এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উত্তর ভারতে গুপ্তবংশের পুরোনো আধিপত্য আর দীর্ঘদিন বজায় রাখা সম্ভব হবে না -

> "খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে গুপ্তবংশজ মহাসেনগুপ্ত মগধে রাজত্ব করিতেন। তখন প্রাচীন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের গৌরবরবি অস্তমিত হইয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের বংশধর সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়া মগধ ও বঙ্গ শাসন করিতেন, কিন্তু সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ তখন হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। ...পরবর্তী সম্রাটগণ প্রাচীন রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে বাস করিতেন। ভারতের প্রাচীন রাজধানী তখন ধ্বংসোন্মুখ, পাটলিপুত্রের তখন শেষ দশা; ধীরে ধীরে কান্যকুব্জের গৌরবরবি উদিত হইতেছে, ভবিষ্যতে আর কখনও মগধের রাজধানী ভারতবর্ষের রাজধানী হয় নাই। ...অতি অল্পকালমধ্যে মৌখরি রাজ্য বিনাশ করিয়া, এবং পশ্চিমপ্রান্তে তৃণগণকে,পরাজিত করিয়া মহাসেনগুপ্তের ভাগিনেয়, প্রভাকরবর্তন উত্তরাপথে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী রাজা হইয়া উঠিয়া-ছিলেন। ...পাটলিপুত্রে, মহাসেনগুপ্ত, সর্ব্বদাই ভাগিনেয়ের ভয়ে ব্যস্ত থাকিতেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, প্রভাকরের পরে উত্তরাপথে গুপ্তবংশের অধিকার লুপ্ত হইবে।"[৩]

উপন্যাসের প্রথম অংশে মগধ একটি রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। বৃদ্ধ ও দুর্বল মহাসেনগুপ্ত কার্যকরভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে পারছেন না; সীমান্ত দুর্গগুলি বহিঃশত্রুর আক্রমণের মুখে পড়ছে এবং স্থানীশ্বরের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে শশাঙ্ককে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে। যশোধবলদেবের আনুগত্য এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমে শশাঙ্কের রাজনৈতিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। যশোধবল তাই কেবল সহায়ক চরিত্র নন; তিনি শশাঙ্কের রাজনৈতিক আদর্শের নির্মাতা। অন্যদিকে বৌদ্ধ সংঘগুলির সঙ্গে সংঘাত উপন্যাসে একটি পৃথক রাজনৈতিক মাত্রা তৈরি করেছে। বৌদ্ধ চরিত্রদের একটি অংশকে শশাঙ্ক-বিরোধী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়েছে। একজন রহস্যময় বৃদ্ধ কুমার শশাঙ্কের ভবিষ্যৎ জীবনের এক করুণ ও সংগ্রামময় চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রথমে বৃদ্ধ শশাঙ্ককে তাঁর পিঙ্গল কেশ দেখে চিনতে পারেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 163 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এরপর তিনি শশাঙ্ককে প্রাচীন গুপ্তবংশের রাজপুত্র স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি জানান, স্কন্দগুপ্তও শশাঙ্কের মতো পিঙ্গলকেশ, বীর, উদার, দয়াশীল ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবন সুখের ছিল না; নানা বিপদ, যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে তাঁকে জীবন কাটাতে হয়েছিল। বৃদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে শশাঙ্কের জীবনেও একই ধরনের দুর্ভাগ্য নেমে আসবে। তিনি রাজা হবেন ঠিকই, কিন্তু রাজ্য ও সিংহাসন নিয়ে তাঁকে নানা ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হতে হবে। তাঁর নিজের ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, ভৃত্য, অমাত্য ও প্রজাদের মধ্য থেকেও বিশ্বাসঘাতকতা আসবে। এমনকি যাঁরা তাঁর প্রতি সত্যিই অনুগত থাকবেন, শশাঙ্ক নিজের দুর্ভাগ্য ও ভুল বিচারবুদ্ধির কারণে তাঁদেরও ঠিকমতো চিনতে পারবেন না। বৃদ্ধ আরও বলেন, শশাঙ্কের বাল্যসখী ও বাক্‌দত্তাও শেষ পর্যন্ত অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে ছেড়ে যাবে। তাঁর নিজের লোকেরা তাঁকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করবে, অথচ বিদেশের লোকেরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করবে। জীবনের শেষ পর্যায়ে শশাঙ্ককে নিজের স্বজাতি ও স্বদেশীয়দের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে হবে এবং বিদেশের মাটিতে যুদ্ধ করতে করতে তাঁর মৃত্যু ঘটবে। তবে এত ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণীর পরও বৃদ্ধ শশাঙ্ককে দুর্বল বা হতাশ হতে বলেননি। বরং তিনি তাঁকে সিংহের মতো সাহসী ও পরাক্রমশালী হয়ে ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পরামর্শ দেন। অর্থাৎ, মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও প্রতিকূলতা থাকলেও একজন বীরের উচিত সেগুলোর কাছে আত্মসমর্পণ না করে সাহসের সঙ্গে নিজের কর্তব্য পালন করা। বৃদ্ধকে বলতে শুনি -

> “কুমার শশাঙ্ক! তুমি রাজা হইবে, কিন্তু তোমার পথ চিরদিন কণ্টকাকীর্ণ থাকিবে, তুমি কখনও সুখী হইবে না। ভ্রাতা, বাক্‌দত্তা বন্ধু, অমাত্য ও প্রজা সকলেই তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। সকলকে হারাইয়া তুমিও স্বন্দগুপ্তের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে মরিবে, কিন্তু স্বদেশে নহে, বিদেশে। স্কন্দগুপ্ত স্বদেশে বিদেশীয়ের সহিত সমরে জীবন বিসর্জন দিয়াছিল; তুমি কিন্তু বিদেশে স্বদেশীয়ের সহিত, স্বজাতির সহিত যুদ্ধে মরিবে’। ‘কুমার! বিষণ্ণ হইও না, তুমি সিংহরাশিতে জন্মিয়াছিলে, কেশরীর ন্যায় পরাক্রমশালী হইবে, অদৃষ্টের নিকট নতশির হইও না, ভাগ্যচক্রের সহিত জীবনব্যাপী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও। বৃদ্ধের কথা শুনিয়া রমণীর চায় ভীত হইও না, পুরুষোচিত কার্য্যের জন্য অগ্রসর হও। শশাঙ্ক! জগতে কাহাকেও বিশ্বাস করিও না, সকলেই স্বার্থের জন্য আসিয়াছে, পরার্থের জন্য কেহই আসে নাই। ... তোমার অসিতবর্ণ ভ্রাতাকে বিশ্বাস করিও না, গৌরবর্ণ কুজপৃষ্ঠ কানরূপ রাজপুত্রকে বিশ্বাস করিও না, যদি কর, তাহা হইলে অদৃষ্টচক্রের পেষণ হইতে অব্যাহতি পাইবে না।”[৪]

ধর্মীয় সংকীর্ণতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, মানবিকতা, সাহস এবং ন্যায়বোধের বিষয়টিও উপন্যাসে লেখক তুলে ধরেছেন। চারুমিত্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়ায় বৈষ্ণব পরিবারের সঙ্গে তাঁর পুত্র বসুমিত্রের বিবাহ মেনে নিতে পারেননি। ধর্মীয় বিদ্বেষ ও অন্ধবিশ্বাসের কারণে তিনি নিজের পুত্রকে ভিক্ষু হতে বাধ্য করেন এবং তার স্বাধীনতাকে নষ্ট করেন। এর ফলে বসুমিত্রের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং তরলার প্রভুকন্যারও করুণ পরিণতি ঘটে। এই পরিস্থিতিতে তরলা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বৌদ্ধমঠ থেকে বসুমিত্রকে উদ্ধার করে এবং নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বের হয়। একজন সাধারণ দাসী হয়েও তরলার সাহস, বিশ্বস্ততা ও মানবিকতা এখানে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সে জানে যে ভিক্ষুগণ তাদের ক্ষতি করতে পারে, তবু ভয় না পেয়ে একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। দীর্ঘাকার পুরুষটি তরলার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং তাদের আশ্বস্ত করে আশ্রয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর মাধ্যমে তাঁর মধ্যে একজন ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাহিতৈষী শাসকের চরিত্র প্রকাশ পায়, যিনি দুর্বল ও নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত। শশাঙ্কের উপস্থিতি ঘটনাটিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে, কারণ তরলার অভিযোগ তাঁর সামনেই প্রকাশিত হয়। বিশেষভাবে কীর্তিধ্বজের মৃত্যুর কথা শুনে দীর্ঘাকার পুরুষের তীব্র ক্রোধ প্রকাশ পাওয়ায় বোঝা যায় যে এই মৃত্যুর সঙ্গে গভীর কোনো রহস্য বা অন্যায় জড়িত এবং ভবিষ্যৎ কাহিনিতে এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়তে পারে। সবশেষে বসুমিত্র তরলার বক্তব্য সত্য বলে স্বীকার করায় ঘটনাটির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই সামগ্রিকভাবে এই অংশে ধর্মীয় বিদ্বেষ ও অন্যায়ের বিপরীতে সাহস, মানবিকতা ও ন্যায়বিচারের শক্তিকে তুলে ধরা হয়েছে এবং একই সঙ্গে পরবর্তী কাহিনির সংঘাতেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 163 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "চারুমিত্র বৌদ্ধধর্ম্মারলম্বী, তিনি এই বিবাহ বন্ধনের প্রস্তাব প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই, কারণ আমার প্রভু বৈষ্ণব। ...আপনি সম্রাট কি না জানি না, কিন্তু আপনি যেই হউন, আপনার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি আপনি দয়ামায়াহীন নহেন, চরণে স্থান দিয়া তিনটি নিরীহ মানবের প্রাণরক্ষা করুন। দিবালোকে, প্রকাশ্য রাজপথে, দেখিতে পাইলে, ভিক্ষুগণ মঠে লইয়া গিয়া আমাদিগকে হত্যা করিবে। নগর এখনও বৌদ্ধ-প্রধান, রাজধানীতে এমন কেহ নাই বে, আমাদিগকে ভিক্ষুগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে। এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তরলা দীর্ঘাকার পুরুষের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিল।"[৫]

এরপর মধ্যাহ্ন পর্বে শশাঙ্কের রাজনৈতিক ও সামরিক জীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। এই অংশের অন্যতম প্রধান ঘটনা যশোধবল দেবের পরিকল্পনায় বঙ্গাভিযান। যুবরাজ যশোধবলদেবের নেতৃত্বে বঙ্গদেশ বিজয়ের অভিযান শুরু হয়। গৌড়ে পৌঁছে তিনি বিপুল সম্মান ও সহযোগিতা লাভ করেন এবং স্থানীয় সৈন্যরা তাঁর বাহিনীতে যোগ দেওয়ায় সেনাবাহিনী আরও শক্তিশালী হয়। এরপর সাম্রাজ্যের সেনারা পৌণ্ডবর্ধন থেকে মেঘনদের পশ্চিম তীর পর্যন্ত একের পর এক বিদ্রোহী সামন্তদের পরাজিত করে। অনেক সামন্ত আত্মসমর্পণ করে এবং রাজস্ব প্রদান করে। কিন্তু মেঘনদের পূর্বতীরের পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। সেখানে বৌদ্ধ সামন্ত ও কৃষকরাও গুপ্তসাম্রাজ্যের বিরোধিতা করছিল এবং বৌদ্ধ নেতারা তাদের অর্থ ও উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করছিলেন। তাই বৃদ্ধ মহানায়ক বুঝতে পারেন যে বঙ্গদেশ জয় করা সহজ হবে না। অন্যদিকে কামরূপরাজও বিদ্রোহীদের প্রকাশ্যে সাহায্য করতে শুরু করেন। মগধের গুপ্তরাজবংশ ও কামরূপরাজদের পুরনো শত্রুতার কারণে কামরূপের হস্তক্ষেপের আশঙ্কা আগে থেকেই ছিল। কামরূপরাজের শত্রুতার সংবাদ পেয়ে যশোধবলদেব বুঝতে পারেন যে এবার মেঘনদ পার হয়ে পরবর্তী অভিযান শুরু করার উপযুক্ত সময় এসেছে -

> "বৌদ্ধাচার্য্যগণের কুপরামর্শে বঙ্গবাসিগণ যশোধবলদেবের পরামর্শ গ্রহন করে নাই। প্রাচ্যে কামরূপ-রাজ ও প্রতীচ্যে স্থায়ীশ্বররাজ বিশ্বয়স্তিমিতনেত্রে প্রাচীন সাম্রাজ্যের নবশক্তির উন্মেষ লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাহাদের ইঙ্গিতেই উদ্ধত বন্ধবাসিগণ রাজস্ব প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। সেই জন্য যশোধবলদেব বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন।"[৬]

এখানে ইতিহাসের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের কল্পনা আরও স্পষ্ট। বঙ্গ দেশে শশাঙ্কের অভিযানকে লেখক কেবল সামরিক অভিযান হিসেবে দেখাননি। এর মধ্যে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা যুক্ত করেছেন।

চিত্রা শশাঙ্ককে খুব ভালবাসে এবং তাঁর যুদ্ধে গিয়ে মারা যাওয়ার আশঙ্কায় চিন্তিত। তাই সে শশাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতি চায় যে তিনি যুদ্ধে মারা যাবেন না এবং যুদ্ধ শেষে পাটলিপুত্রে তার কাছে ফিরে আসবেন। শশাঙ্ক চিত্রাকে স্পর্শ করে সেই প্রতিশ্রুতি দেন, এতে চিত্রা আশ্বস্ত ও আনন্দিত হয়। ঔপন্যাসিক এই অংশটুকু কল্পনার মিশ্রণে যেভাবে তুলে ধরেছেন -

> "চিত্রা তাহা শুনিল না, কহিল, 'বল তুমি মরিবে না?' কুমার হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, 'ভাল, তবে মরিব না'।
>
> চিত্রা-তাহা হইবে না, আমাকে ছু'ইয়া শপথ করিয়া বল।
>
> শশাঙ্ক-এই তোমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, চিত্রা! 'বঙ্গ-দেশের যুদ্ধে আমি মরিব না।'
>
> চিত্রা-বল আবার ফিরিয়া আসিবে? ...শশাঙ্ক-তোমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি 'বঙ্গদেশের যুদ্ধ হইতে আমি আবার তোমার নিকটে এই পাটলিপুত্র নগরে ফিরিয়া আসিব।"[৭]

যুদ্ধে শশাঙ্ক অচেতন হয়ে নদীতে পড়ে যান, তাঁকে বাঁচাতে শত্রুসেনও ঝাঁপ দেন, আর আকস্মিক প্রবল ঝড়ের কারণে যুদ্ধ থেমে যায়। যুদ্ধে আহত হয়ে শশাঙ্কের স্মৃতিভ্রংশ হওয়ার পরবর্তী অবস্থা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন -

> "তোর নৌকায় বেড়াইতে ভাল লাগে? লাগে, আমার বড় ভাল লাগে, নদীর জলে আমার যেন কি হারাইয়া গেছে, মনে হয় আবার যেন তাহা খুঁজিয়া পাইব, ভাই ভাল লাগে।"[৮]

এই অংশে যুবরাজ শশাঙ্কের মৃত্যুসংবাদে মহানায়ক যশোধবল এবং মাগধসেনাদের গভীর শোক, আত্মগ্লানি ও শশাঙ্কের প্রতি অটুট আনুগত্যের চিত্র ফুটে উঠেছে। যশোধবল মনে করেন, তিনি নিজেই শশাঙ্কের মৃত্যুর জন্য দায়ী, কারণ তিনি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 163 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তাকে যুদ্ধ করতে শিখিয়েছিলেন, কিন্তু আত্মরক্ষা করতে শেখাননি। শশাঙ্ক তাঁর ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যুদ্ধে গিয়েছিল, অথচ তিনি তাকে রক্ষা করতে পারেননি— এই অপরাধবোধে তিনি ভেঙে পড়েন। একই সঙ্গে তিনি চিন্তা করতে থাকেন, শশাঙ্কের মাকে এবং বৃদ্ধ মহাসেনগুপ্তকে কীভাবে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেবেন -

> “বীরেন্দ্রসিংহ কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাহাকে বাধা দিয়া যশোধবল-দেব বলিতে লাগিলেন, "সান্ত্বনা দিতে আসিও না, দুগ্ধপোষ্য শিশু লইয়া মরণের সহিত রঙ্গ করিতে আসিয়াছিলাম, তখন বুঝিতে পারি নাই কি করিতেছি। পুত্রবৎসল বৃদ্ধসম্রাট নগরতোরণে আসিয়া তাহাকে আমার হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিল, বামচক্ষুর স্পন্দনে ভীত হইয়া বলিয়া-ছিল, ‘যশোধবল, যুদ্ধে যাহা হয় হউক, শশাঙ্ককে ফিরাইয়া আনিও।’ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আমি জন্মের মত তাঁহার নয়নপুত্তলি ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছি। আমার নিকট মহাসেনগুপ্ত সম্রাট নহে, মগধের রাজা নহে, সে আমার বাল্যবন্ধু। ...
> "শশাঙ্ককে আমি হত্যা করিয়াছি। সে জানিত যে, যশোধবল জীবিত থাকিতে কেহ তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না।” ...কীর্ত্তিধবলকে হারাইয়াছি, তাহা সহ্য হইয়াছে, শশাঙ্কের মৃত্যুও সহ্য হইবে। তবে তিন দিন হইতে কি ভাবিতেছি জান? পুত্রহীনা মাতাকে কি বলিব? বৃদ্ধ মহাসেন-গুপ্তকে কি বলিব?”[৯]

এ সময় আহত অনন্তবর্মা শশাঙ্ককে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে আসে। শশাঙ্কের মৃত্যু হয়েছে জানতে পেরে সে গভীরভাবে শোকাহত হয় এবং ঘোষণা করে যে, শশাঙ্ক ফিরে না এলে সে আর পাটলিপুত্রে ফিরবে না। সে তরবারি স্পর্শ করে শপথ করে এবং নিজের তরবারি ভেঙে ফেলে। অনন্তবর্মার এই শপথে অনুপ্রাণিত হয়ে মাগধসেনারাও শপথ করে যে, যুবরাজ শশাঙ্ক ফিরে না এলে তারাও কেউ মগধে ফিরবে না। শুধু অনন্তবর্মাই নন সকলে একে একে বলতে লাগলেন -

> “তখন একে একে মাধববর্মা, বসুমিত্র, বীরেন্দ্রসিংহ প্রভৃতি সেনা-নায়কগণ অগ্রসর হইয়া কহিলেন যে, তাঁহারা সকলেই বিদ্রোহী, কেহই পাটলিপুত্রে ফিরিবেন না।”[১০]

সমগ্র সৈন্যদলের মধ্যে শশাঙ্কের প্রতি গভীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ পায়। শেষপর্যন্ত যশোধবল অশ্রুসিক্ত হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং আহত অনন্তবর্মা তাঁর পায়ের কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। প্রিয়জনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও আত্মগ্লানির পাশাপাশি শশাঙ্কের প্রতি যশোধবল ও মাগধসেনাদের অটুট ভালোবাসা, আনুগত্য এবং আত্মত্যাগের মানসিকতা। বিভিন্ন সামন্তরাজা, প্রজা, বৌদ্ধ সংঘ এবং আঞ্চলিক শক্তির পারস্পরিক সংঘাতের মাধ্যমে সপ্তম শতকের একটি রাজনৈতিক ভূদৃশ্য নির্মাণ করেছেন। ভাস্করবর্মার সঙ্গে শশাঙ্কের সংঘর্ষ, শঙ্কর নদীর যুদ্ধ, শশাঙ্কের আহত হওয়া এবং পরবর্তীকালে তাঁর স্মৃতিলোপ— এই ঘটনাগুলির মধ্যে ইতিহাস ও রোমাঞ্চকর আখ্যানের একটি সমন্বয় লক্ষ করা যায়। বিশেষত স্মৃতিলোপের ঘটনা কাহিনির নাটকীয়তা বাড়ানোর পাশাপাশি নায়ককে সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে।

‘সায়াহ্ন’ অংশে শশাঙ্কের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিপর্যয় সমান্তরালভাবে এগিয়েছে। চিত্রার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, চিত্রার আত্মহত্যা, মাধবগুপ্তের সঙ্গে বিরোধ এবং রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব—সবকিছু মিলিয়ে শশাঙ্কের জীবনে ব্যক্তিগত সুখ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। এই অংশে চিত্রা-পর্বটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি ঐতিহাসিক আখ্যানের মধ্যে সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত একটি আখ্যান। চিত্রার মৃত্যু শশাঙ্কের ব্যক্তিগত জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়। তাঁর রাজ্য ও ক্ষমতার প্রতি যে আবেগ ছিল, তাতেও এর অভিঘাত পড়ে। রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাটকীয় মুহূর্ত। রাখালদাস ইচ্ছাকৃতভাবে শশাঙ্ককে হত্যাকারী বা ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে উপস্থাপন না করে এমন পরিস্থিতি নির্মাণ করেছেন যেখানে আত্মরক্ষার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু ঘটে। মহাসেনগুপ্তের মৃত্যুর পর প্রাচীন সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিদ্রোহ ও ধর্মীয় সংঘাত দেখা দেয়। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিরোধের ফলে অত্যাচার শুরু হয় এবং বহু দেবমন্দিরের সম্পত্তি দখল করা হয়। অন্যদিকে রাজকোষ শূন্য হয়ে যাওয়ায় রাজস্ব আদায় বন্ধ হয়ে যায় এবং সৈন্যরা বেতন ও খাদ্যের অভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রাম লুট করতে শুরু করে। প্রজারা আত্মরক্ষার জন্য

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 163 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে সাম্রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি হয় এবং রাজা অসহায়ভাবে রাজ্যের এই দুর্দশা দেখতে থাকেন -

> "রাজকোষ শূন্য হইল, তখন চারিদিক হইতে রাজস্ব প্রেরণ স্থগিত হইয়াছে। বেতন না পাইয়া সেনাদল অন্নাভাবে মরিতেছিল, ক্রমশঃ অভাবে তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, সেনা নায়কগুণের আদেশ অবহেলা করিয়া গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করিতে লাগিল, প্রজাবৃন্দ আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল, দেশ অরাজক হইয়া উঠিল। যশোধবলদেব পাটলিপুত্রে থাকিয়া চিত্রপুত্তলিকার নলয় রাজ্যের দুর্দশা দেখিতে লাগিলেন।"[১১]

চিত্রার সঙ্গে শশাঙ্কের যে সম্পর্ক যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে প্রতিশ্রুতি মগধে ফিরে এসে কোন এক নাগরিকের মুখে শুনতে পান চিত্রার বিবাহের কথা -

> "সৈনিক স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, 'চিত্রাদেবীর কি হইয়াছে।' নাগরিক কহিল, "তুমি কখন নগরে আসিয়াছ? চিত্রাদেবীর সহিত সম্রাট মাধবগুপ্তের বিবাহ, তাহা কি তুমি জান না?"[১২]

চিত্রা একসময় শশাঙ্কের বাল্যসখা ও প্রিয়জন ছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে তাঁর অন্যত্র বিবাহ হয়। বহুবছর পর শশাঙ্ক ফিরে এসে চিত্রার সঙ্গে দেখা করেন। চিত্রা বারবার শশাঙ্কের ক্ষমা চাইতে থাকে এবং জানায় যে সে নিজের ইচ্ছায় বিবাহ করেনি। শশাঙ্ক তাকে দোষ না দিয়ে নিজের ভাগ্যকেই দায়ী করেন এবং বলেন -

> "দূরদেশে চৈতন্য হারাইয়া এতদিন অজ্ঞাতবাস করিয়াছি। জ্ঞান হইয়া শুনিলাম পিতা নাই, তথাপি যথাশক্তি দ্রুতবেগে পাটলিপুত্রে আসিয়াছি। কেন জান চিত্রা? মনে বড় আশা ছিল তোমাকে দেখিতে পাইব, কত সুখী হইব। ভাবিতাম, আবার : তুমি তেমনি করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তোমার উচ্চহাস্তে দিগন্ত মুখরিত হইবে, তোমাকে লইয়া দুঃখশোক ভুলিয়া যাইব।"[১৩]

চিত্রা এখন তাঁর ভ্রাতৃবধূ ও মগধের মহাদেবী— তাই তাঁদের পুরোনো সম্পর্ক আর ফিরে আসতে পারে না -

> "চিত্রাদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে শশাঙ্কের চরণযুগল বারণ করিতে যাইতেছিলেন, সম্রাট দুই হস্ত পিছু হটিয়া কহিলেন, 'ছি, ছি, চিত্রা, স্পর্শ করিও না। তুমি ভ্রাতৃবধূ, অস্পৃহা। আজ তুমি মগধের পট্টমহাদেবী দীনহীন ভিখারীর চরণতলে লুটাইয়া পড়া কি তোমার উপযুক্ত কার্য্য। উঠ, বাল্যবন্ধুকে অভ্যর্থনা কর'।"[১৪]

শশাঙ্ক শুধু চিত্রার অনুরোধে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ফিরে এসেছিলেন। তিনি চিত্রাকে পুরোনো প্রেম ও স্মৃতি ভুলে গিয়ে স্বামীসহ সুখী হতে বলেন। শেষবার চিত্রা তাঁকে আগের মতো ভালোবেসে ডাকতে বললেও শশাঙ্ক নিজেকে সংযত করেন এবং 'চির বিদায়' বলে চলে যেতে উদ্যত হন। এরপর চিত্রা গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। চিত্রার এই পরিণতি দেখে শশাঙ্কও শোক ও হতাশায় গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতি ও ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে শশাঙ্ক ও চিত্রার মিলন অসম্ভব হয়ে যায়; শেষপর্যন্ত তাদের প্রেম করুণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করে।

শশাঙ্ক ও রাজ্যবর্ধনের মধ্যে কান্যকুজ ও সীমার অধিকার নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়। যুদ্ধ হলে দুই পক্ষের অসংখ্য সৈন্য মারা যাবে ভেবে শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে প্রস্তাব দেন যে, সেনাবাহিনী না লড়িয়ে তাঁরা দুজন একাই দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবেন। রাজ্যবর্ধন প্রস্তাবে রাজি হন। পরদিন গঙ্গাতীরে তাঁদের মধ্যে তলোয়ারের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শশাঙ্ক আত্মরক্ষা করছিলেন এবং রাজ্যবর্ধনকে আঘাত করছিলেন না। কিন্তু হঠাৎ শশাঙ্কের তলোয়ার পিছলে গিয়ে রাজ্যবর্ধনের গলায় আঘাত করে, ফলে রাজ্যবর্ধন মারা যান। এরপর তাঁর সৈন্যরা পালিয়ে যায় এবং শশাঙ্ক কান্যকুজে ফিরে আসেন। লতিকাদেবী নিখোঁজ হওয়ার পর সম্রাট শশাঙ্ক মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং পাটলিপুত্রে ফিরে আসেন। এদিকে হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি চললেও শশাঙ্কের মনোবল দুর্বল হয়ে যায়। ঠিক সেই সময়ে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা গুপ্তসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ করলে শশাঙ্কের চেতনা ফিরে আসে এবং তিনি হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে অভিযান করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু যুদ্ধের প্রস্তুতির মধ্যেই জানা যায়, বৌদ্ধাচার্যদের প্ররোচনায় মগধ ও অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। এমনকি শশাঙ্ককে হত্যার ষড়যন্ত্রও চলছে। এক আততায়ী শশাঙ্ককে হত্যা করতে এলে তাঁর বিশ্বস্ত মহাপ্রতীহার বিনয়সেন নিজের দেহ দিয়ে সম্রাটকে রক্ষা করেন এবং নিজে প্রাণ দেন। মৃত্যুর আগে তিনি শশাঙ্ককে পাটলিপুত্র ত্যাগ করার জন্য সতর্ক করেন। বিনয়সেনের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 163 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মৃত্যু, প্রিয়জনদের হারানো এবং ক্রমবর্ধমান ষড়যন্ত্রে শশাঙ্ক গভীরভাবে বিচলিত হয়ে পাটলিপুত্র ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আদেশ দেন, একপক্ষের মধ্যে নগরবাসী যেন পাটলিপুত্র ছেড়ে চলে যায়। তাঁর মনে প্রবল ক্ষোভ ও দুঃখ থেকে তিনি পাটলিপুত্র সম্পর্কে কঠোর অভিশাপও দেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই একসময়ের সমৃদ্ধ পাটলিপুত্র জনশূন্য হয়ে পড়ে। শশাঙ্কের মানসিক বিপর্যয়, গুপ্তসাম্রাজ্যের ওপর বহুমুখী আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র, বিশ্বস্ত বিনয়সেনের আত্মত্যাগ এবং শেষ পর্যন্ত শশাঙ্কের পাটলিপুত্র ত্যাগ ও নগরী পরিত্যক্ত হওয়ার ঘটনাকে লেখক যেভাবে ব্যক্ত করেছেন -

> "এখনই পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করিব। আমি অভিশাপ দিতেছি সহস্র বর্ষ মধ্যে পাটলিপুত্রে যে বাস করিতে আসিবে, সে নির্বংশ হইবে, তাহার পিণ্ড লোপ হইবে, শৃগাল কুকুরে তাহার দেহ ভক্ষণ করিবে। বুদ্ধশ্রীকে অগ্নিতে দগ্ধ করিও। নগ্নপদে তরুণ সম্রাট সেই মুহূর্তেই প্রাচীন পাটলিপুত্র নগর পরিত্যাগ করিলেন। পক্ষমধ্যে বিশাল নগরী জনশূন্য হইয়া গেল। শশাঙ্কের অভিশাপ ভয়ে সহস্র বর্ষ মধ্যে কেহই পাটলিপুত্র নগরে বাস করিতে আসে নাই।"[১৫]

শশাঙ্ক মগধে ফিরে এসে শত্রুদের পরাজিত করে কর্ণসুবর্ণ আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিশ্বস্ত সেনানায়ক অনন্তবর্মা এবং তরুণ বীর রমাপতি। তাম্রলিপ্তির কাছে রাতে শশাঙ্কের শিবিরে শত্রুরা অতর্কিত আক্রমণ করলে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়। রমাপতি শশাঙ্ককে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর আহত হন। অনন্তবর্মা শশাঙ্ককে রক্ষা করতে গিয়ে একে একে শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিহত হন। শশাঙ্কও শূলের আঘাত ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়েন এবং মাধবগুপ্তের আঘাতে অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে যান। শত্রুরা তাঁকে মৃত মনে করে আনন্দে মেতে ওঠে এবং শিবির লুট করতে শুরু করে। কিন্তু রমাপতি তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি শশাঙ্কের দেহে প্রাণের অস্তিত্ব বুঝতে পেরে নিজের বর্ম খুলে তাঁকে শত্রুদের চোখের আড়ালে নিয়ে পালিয়ে যান। শশাঙ্কের প্রতি রমাপতি ও অনন্তবর্মার অসীম আনুগত্য, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ এবং যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও রমাপতির শশাঙ্ককে রক্ষা করার ঘটনা তুলে ধরেছেন। 'অনন্ত যাত্রী' অংশে মূলত সম্রাট শশাঙ্কের মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত, লতিকার গভীর প্রেম ও আত্মত্যাগ এবং ভাগ্যের অনিবার্য পরিণতি তুলে ধরেছেন। যুদ্ধে গুরুতর আহত শশাঙ্ক সমুদ্রতীরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছিলেন। তাঁর প্রিয় লতিকা পুরুষের ছদ্মবেশে 'রমাপতি' নামে তাঁর সেনাদলে যোগ দিয়েছিল, শুধু শশাঙ্কের কাছে থাকার জন্য। মৃত্যুর আগে লতিকা শশাঙ্কের কাছে নিজের ভালোবাসার স্বীকৃতি চায়। শশাঙ্কও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেন যে তিনি লতিকাকে ভালোবাসেন এবং তাঁর দেহের সামান্য অংশের অধিকার লতিকাকে দেন। লতিকা সেই ভালোবাসার স্মারক হিসেবে তাঁর দেওয়া পিতামহীর হীরকের বলয় গ্রহণ করে। এরপর শশাঙ্ক তৃষ্ণার্ত হলে লতিকা জল আনতে যায়। সেই সুযোগে শশাঙ্ক নিজের সেনাদলের কথা চিন্তা করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যুবরণ করেন। ফিরে এসে লতিকা তাঁর মৃত্যু দেখে শোকাহত হয়ে তাঁর পাশে শুয়ে পড়ে এবং বোঝা যায় যে শশাঙ্ককে ছেড়ে বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছা তার নেই। শেষে এক বৃদ্ধ এসে শশাঙ্কের মৃত্যুর সংবাদ না জেনেই বিজয়ের খবর দিতে চায়। কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না। বৃদ্ধ বুঝতে পারে যে সবকিছু পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যের মতোই ঘটেছে। অপূর্ণ প্রেম, আত্মত্যাগ, মৃত্যু এবং অদৃষ্টের অনিবার্যতার করুণ কাহিনি। সূর্যাস্ত ও সমুদ্রের বিশাল ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে গল্পের সমাপ্তি ঘটে -

> "চালুক্যরাজ আসিতেছেন, নর্মদাতীরে হর্ষ পরাজিত হইয়াছে, গাত্রোত্থান করুন। কেহই উত্তর দিল না দেখিয়া বৃদ্ধ নিকটে আসিলেন ও শবদ্বয় পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "আশ্চর্য্য বন্ধুগুপ্ত, তোমার গণনা আশ্চর্য্য! ভাগ্যচক্র রেখামাত্র বিচলিত হয় নাই। অনন্তের পরপারে দাঁড়াইয়া সঙ্ঘস্থবির, তোমার আশ্চর্য্য গণনাশক্তির জন্য তোমাকে নমস্কার করিতেছি। দিবাকর তখন অস্তগমনোন্মুখ, সান্ধ্যসমীরণে মহাসমুদ্রের প্রশান্ত বক্ষ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সহসা একটি বৃহৎ তরঙ্গ লম্ফ দিয়া আকাশ হইতে বৃদ্ধ তপনকে গ্রাস করিয়া পুনরায় সমুদ্রবক্ষে বিলীন হইল,-জগৎ অন্ধকার-মগ্ন হইল।"[১৬]

প্রভাত-মধ্যাহ্ন-সায়াহ্ন শুধু সময়বিভাগ নয়; এটি শশাঙ্কের জীবনের উত্থান, পরিণতি ও অবসানের করুণচিত্র। যেখানে ব্যক্তিজীবনের দিনচক্রের সঙ্গে রাজনৈতিক ভাগ্যচক্রকে এক করে দেখানো হয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 163 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শশাঙ্ককে রাখালদাস একাধারে রাজা, যোদ্ধা, প্রেমিক এবং ট্র্যাজিক নায়ক হিসেবে নির্মাণ করেছেন। তাঁর চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলি লেখক ফুঁটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তা হল— বীরত্ব ও নেতৃত্ব — শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের সম্ভাবনা দেখা যায়। দেশ ও রাজ্যের প্রতি দায়িত্ববোধ — ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে রাজ্যের স্বার্থকে তিনি অধিক গুরুত্ব দেন। মানবিকতা — চিত্রার প্রতি তাঁর প্রেম, অনুগতদের প্রতি তাঁর আচরণ এবং রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ এড়ানোর চেষ্টা তাঁর মানবিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে দিক প্রকাশ করে। নৈতিক দ্বন্দ্ব — রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং পরবর্তী ঘটনাবলি তাঁকে ক্রমাগত নৈতিক সংকটের মুখোমুখি করে। শশাঙ্ককে শুধু ঐতিহাসিক রাজা হিসেবে দেখলে তাঁর ঔপন্যাসিক তাৎপর্য সম্পূর্ণ ধরা পড়ে না। রাখালদাসের শশাঙ্ক মূলত এমন এক নায়ক যিনি ব্যক্তিগত সুখ বিসর্জন দিয়ে ইতিহাসের বৃহত্তর দায়িত্ব বহন করেন এবং শেষপর্যন্ত সেই ইতিহাসের নির্মমতার শিকার হন।

শশাঙ্কের বিপরীতে যশোধবলদেব চরিত্রটি উপন্যাসে একটি নৈতিক আদর্শ নির্মাণ করে। তিনি শশাঙ্কের মধ্যে ভবিষ্যৎ রাজার সম্ভাবনা দেখতে পান এবং তাঁর রাজনৈতিক উত্থানের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। যশোধবলের চরিত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে রাষ্ট্র ও রাজভক্তি প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি শশাঙ্ককে শুধু অস্ত্রবিদ্যা শেখান না; রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, রাজ্যপরিচালনা এবং নেতৃত্বের পাঠও দেন।

চিত্রা, লতিকা, যুথিকা-তরলা এবং ভব-নবীনের উপকাহিনিগুলি উপন্যাসের মূল ঐতিহাসিক আখ্যানকে মানবিক করে তুলেছে। এগুলি ইতিহাসের মূল গতিপথ পরিবর্তন না করেও চরিত্রগুলির আবেগ ও ব্যক্তিগত সংকটকে প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে শশাঙ্ক-চিত্রা সম্পর্কের পরিণতি শশাঙ্কের চরিত্রে গভীর ট্র্যাজিক মাত্রা যোগ করে। পরবর্তীকালে লতিকার আত্মত্যাগ আবার শশাঙ্কের জীবনের নিঃসঙ্গতাকে আরও তীব্র করে তোলে। এই উপকাহিনিগুলির সাফল্য এই যে, এগুলি ইতিহাসের বিকল্প হয়ে ওঠেনি; বরং ইতিহাসের ফাঁক পূরণ করেছে। ফলে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি পাঠকের কাছে নিছক তথ্য হিসেবে উপস্থিত না হয়ে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

শশাঙ্ক রচনার ক্ষেত্রে বাণভট্টের হর্ষচরিত এবং হিউয়েন সাঙের বিবরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সূত্রগুলিতে শশাঙ্কের চরিত্র ও রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে, রাখালদাস তার পুনর্বিচার করতে চেয়েছেন। বিশেষত রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর প্রসঙ্গে তাঁর অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক সূত্রে শশাঙ্ককে রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী হিসেবে দেখানোর প্রবণতা থাকলেও উপন্যাসে তিনি এমন একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি নির্মাণ করেছেন যেখানে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু অনিচ্ছাকৃত। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শশাঙ্ক বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রয়াস। এর গুরুত্ব কেবল এই কারণে নয় যে, এতে সপ্তম শতকের এক ঐতিহাসিক রাজাকে কেন্দ্র করে কাহিনি নির্মিত হয়েছে। এর প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত রয়েছে ইতিহাসকে সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লেখকের সচেতন প্রয়াস। শশাঙ্ক ইতিহাস তথ্যের সমষ্টি নয়; তা একটি জীবন্ত সাংস্কৃতিক স্মৃতি। রাখালদাস প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক অস্তিত্ব, গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার, হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘাত, গৌড়ের উত্থান এবং শশাঙ্কের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে একত্র করে বাঙালির অতীতকে নতুনভাবে পাঠ করতে চেয়েছেন। তাঁর শশাঙ্ক তাই একই সঙ্গে ঐতিহাসিক রাজা, রাজনৈতিক নেতা এবং ট্র্যাজিক নায়ক। ইতিহাস ও কল্পনার সম্পর্কও এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে যশোধবল, চিত্রা, লতিকা প্রমুখ কল্পিত চরিত্রের সংযোজন ইতিহাসকে মানবিক ও রসগ্রাহ্য করেছে। ফলে শশাঙ্ক একদিকে ইতিহাসের জনপ্রিয়ীকরণ, অন্যদিকে ইতিহাসের সৃজনশীল পুনর্নির্মাণ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, উপন্যাসটির অন্তর্নিহিত বিষয় হল প্রাচীন বাংলাকে একটি সক্রিয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা হিসেবে পুনরাবিষ্কার করা। এই অর্থে শশাঙ্ক শুধু একজন রাজার জীবনকাহিনি নয়; এটি বাঙালির অতীত-অনুসন্ধান, আত্মপরিচয় নির্মাণ এবং ইতিহাসকে সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক সম্পদে পরিণত করার একটি সাহিত্যিক প্রয়াস। শশাঙ্ক-কে মূল্যায়ন করতে হলে একদিকে তার ঐতিহাসিক উপাদানের যথার্থতা বিচার করতে হবে, অন্যদিকে মনে রাখতে হবে যে এটি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নয়— বরং ইতিহাসের উপর দাঁড়িয়ে নির্মিত একটি সাহিত্যিক কল্পজগৎ। রাখালদাসের সাফল্য এখানেই যে, তিনি প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের ‘বন্ধুর পথ’ থেকে কথাসাহিত্যের ‘প্রশস্ত সমতলবর্গে’ এসে প্রাচীন বাংলার একটি স্মরণীয় সাহিত্যিক প্রতিমূর্তি নির্মাণ করতে পেরেছেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 19
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 163 - 173
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখাল, 'শশাঙ্ক', মহিয়ারী পাবলিক লাইব্রেরি, হাওড়া, প্রথম প্রকাশ-১৯১৪, পৃ. ১
২. তদেব, পৃ. ২৪
৩. তদেব, পৃ. ৪-৫
৪. তদেব, পৃ. ৭৬-৭৭
৫. তদেব, পৃ. ১৬৮-১৬৯
৬. তদেব, পৃ. ১৯১
৭. তদেব, পৃ. ২১৪
৮. তদেব, পৃ. ৩০০
৯. তদেব, পৃ. ৩০৬-৩০৯
১০. তদেব, পৃ. ৩০৯
১১. তদেব, পৃ. ৩৪০
১২. তদেব, পৃ. ৩৪৪
১৩. তদেব, পৃ. ৩৪৯
১৪. তদেব, পৃ. ৩৪৭
১৫. তদেব, পৃ. ৪২৪
১৬. তদেব, পৃ. ৪৫৬

Bibliography:

রায়, যোগীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), মানসী ও মর্মবাণী, মানসী প্রেস, কলিকাতা, ১৩২৫, পৃ. ৩১৮
মজুমদার, রমেশচন্দ্র, 'বাংলা দেশের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১৩, পরিবর্তিত চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৭৩
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, মনমোহন প্রকাশনী, কলিকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬০
সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র, 'শশাঙ্ক', 'শতবর্ষের আলোয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়', কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত (সম্পা.)
রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২০
দাস, সন্দীপ, 'রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য' বর্ধমান ইউনিভার্সিটি, ২০২৫